

পদ (parts of Speech)

★ পদ (parts of Speech) :

বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি অর্থবোধক শব্দকে পদ বলে। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে-শব্দ বিভক্তি এবং ধাতু বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলা হয়। যেমন : ঝড়ে ঝড়ে পড়া গাছের পাতায় স্মৃতির কাঁদে।

পদ প্রধানত পাঁচ প্রকার। যথা :

১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. অব্যয় ৫. ক্রিয়া।

★ বিশেষ্য পদ:

যে সব পদ কোন কিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। অর্থাৎ-বাক্য মধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ কোন ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, সে সব পদকে বিশেষ্য পদ বলা হয়। বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা:-

১. সংজ্ঞা (বা নাম) বাচক বিশেষ্য (Proper Noun)
২. জাতিবাচক বিশেষ্য (Common Noun)
৩. বস্তু (বা দ্রব্য) বাচক বিশেষ্য (Material Noun)
৪. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (Collective Noun)
৫. ভাববাচক বিশেষ্য (Verbal Noun)
৬. গুণবাচক বিশেষ্য (Abstract Noun)

১: বাচক বিশেষ্য (বা নাম) সংজ্ঞা . যে পদ কোন ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম নির্দেশ করে, তাকে সংজ্ঞা বা নামবাচক বিশেষ্য বলে।

ব্যক্তির নাম : মাহফুজ, রিফাত, মাসুম, হাসান, সুমি।

ভৌগোলিক স্থানের নাম : ভিয়েতনাম, ইরাক, কোরিয়া, বাংলাদেশ।

বৃক্ষরাজির নাম : শিমুল, কাঁঠালগাছ, আমগাছ, বটগাছ।

গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, বিষাদসিন্ধু।

২: জাতিবাচক বিশেষ্য . যে পদ কোন এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে।

যেমন : মানুষ, গরু, পাখি, গাছ, নদী, ইংরেজি।

৩. বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য : যে পদ কোন বস্তু, উপাদান নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য

বলে। এই জাতীয় বস্তুসংখ্যা পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যথা : বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চিনি, লবণ।

৪: সমষ্টিবাচক বিশেষ্য . যে পদ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি বোঝায়, তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলা হয়।

যথা : সভা, জনতা, সমিতি, পঞ্চায়েত মাহফিল, বাঁক, বহর, দল।

৫: ভাববাচক বিশেষ্য . যে বিশেষ্য পদে কোন ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ভাববাচক বিশেষ্য বলে

যথা : গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), দেখা, শোনা।

৬: গুণবাচক বিশেষ্য . যে বিশেষ্য দ্বারা কোন বস্তুসংখ্যার দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য।

যথা : মধুরতা, তারল্য, তারুণ্য, সৌন্দর্য, বীরত্ব।

উদাহরণের শব্দগুলো গুণবাচক বিশেষ্য। এখানে মধুর মিষ্টত্বের গুণ- মধুরতা, তরল দ্রব্যের গুণ-তারল্য, তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ- তিক্ততা, তরুণের গুণ-তারুণ্য, সুন্দর বস্তুসংখ্যার গুণ-সৌন্দর্য, বীরের গুণ-বীরত্ব। তদ্রূপ-সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি।

☆ বিশেষণ পদ:

যা কোন কিছুকে বিশিষ্ট করে, তাই বিশেষণ। অর্থাৎ যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে।

যেমন : বিশেষ্যের বিশেষণ : বিকৃত চেহারা

সর্বনামের বিশেষণ : কালো তুমি

ক্রিয়া বিশেষণ : দ্রুত চল

বিশেষণ দুভাবে বিভক্ত। যথা :

১. নাম বিশেষণ

২. ভাব বিশেষণ

১: নাম বিশেষণ . যে বিশেষণ পদ কোন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে।

যথা :

বিশেষ্যের বিশেষণ : সুস্থ-সবল দেহ।

সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুনবান।

★ নাম বিশেষণের উদাহরণসহ প্রকার ভেদ

১. রূপবাচক : সাদাচুল, সবুজ মাঠ, কালমেঘ
২. গুণবাচক : দক্ষ কারিগর, ঠান্ডা হাওয়া, চৌকস লোক
৩. অবস্থাবাচক : তাজা মাছ, রোগা ছেলে, খোঁড়া পা
৪. সংখ্যাবাচক : তিনকন্যা, হাজার লোক, চার টাকা, দশ দশা, শ টাকা
৫. ক্রমবাচক : দশম শ্রেণী, সত্তর পৃষ্ঠা, প্রথম কন্যা
৬. পরিমাণবাচক : তিন একর জমি, অল্প আলো, একটু জল, দু কিলোমিটার
৭. অংশবাচক : অর্ধেক সম্পত্তি, ষোল আনা দখল, সিকি পথ
৮. উপাদানবাচক : এটেল মাটি, মেটে কলসী, পাথুরে মূর্তি
৯. প্রশ্নবাচক : কতদূর পথ ? কেমন অবস্থা ?
১০. নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক : এই লোক, সেই ছেলে, একুশে ফেব্রুয়ারি।

★ বিভিন্নভাবে বিশেষণ গঠনের পদ্ধতি

১. ক্রিয়াজাত : হারানো সম্পত্তি, খাবার পানি, অনাগত দিন।
২. অব্যয়জাত : আচ্ছা মানুষ, উপরি পাওনা, হঠাৎ বড়লোক।
৩. সর্বনামজাত : কবেকার কথা, কোথাকার কে, স্বীয় সম্পত্তি।
৪. সমাসসিদ্ধ : বেকার, নিয়ম-বিরুদ্ধ, জ্ঞানহারা, চৌচালা ঘর।
৫. বীজ্যমূলক : হাসিহাসি মুখ, কাঁদো কাঁদো চেহারা, ডুবুডুবু নৌকা।
৬. অনুকার অব্যয়জাত : কনকনে শীত, শনশনে হাওয়া, ধিকিধিকি আগুন, টসটসে ফল, তকতকে মেঝে।
৭. কৃদন্ত : কৃতী সন্তান, জানাশোনা লোক, পায়ে-চলা পথ, হৃত সম্পত্তি, অতীত কাল।
৮. তদ্ধিদান্ত : জাতীয় সম্পদ, নৈতিক বল, মেঠো পথ।
৯. উপসর্গযুক্ত : নিখুঁত কাজ, অপহৃত সম্পদ, নির্জলা মিথ্যে।
১০. বিদেশি : নাস্তানাবুদ অবস্থা, লাওয়ারিশ মাল, লাখেরাজ সম্পত্তি, দরপত্তনি তালুক।

ভাব বিশেষণ : যে বিশেষণ পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে

বিশেষিত করে তা-ই ভাব বিশেষণ। ভাব বিশেষণ চার প্রকার :

১. ক্রিয়া বিশেষণ, ২. বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ, ৩. অব্যয়ের বিশেষণ ৪. বাক্যের বিশেষণ।

১: ক্রিয়া বিশেষণ . যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব বা অবস্থা, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা:

ক. ক্রিয়া সংঘটনের ভাব : ধীরে ধীরে বাতাস প্রবাহিত হয়।

খ. ক্রিয়া সংঘটনের কাল : পরে একবার এসো।

২: বিশেষণীয় বিশেষণ . যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যথা:

ক. বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুখ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

খ. ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ : রকেট অতি দ্রুত চলে।

৩: অব্যয়ের বিশেষণ . যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে।

যথা-ধিক্ তারে শত ধিক্ নিলজ্জ যে জন।

৪: বাক্যের বিশেষণ . কখনো কখনো কোন বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলা হয়।

যেমন- দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যা জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

সর্বনাম পদ

বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।

যেমন:- আমি, তুমি, সে, তিনি ইত্যাদি।

সর্বনাম পদের ব্যবহার ভাষার পুনরাবৃত্তি রোধ করে এবং ভাষাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করে।

যেমন:-

হাসান খুব ভালো ছাত্র।

হাসান প্রত্যহ কলেজে যায়।

ক্লাসের বন্ধুরা হাসানকে খুব পছন্দ করে।

এ বাক্যগুলোতে ‘হাসান’ শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হওয়ায় শ্রুতিকটু হয়েছে। ভাষা থেকে এ পুনরাবৃত্তি দোষ রোধ করার জন্য ‘হাসান’ শব্দটি বারবার ব্যবহার না করে এরূপ লেখা বাঞ্ছনীয়:-

হাসান খুব ভালো ছাত্র।

সে প্রত্যহ কলেজে যায়।

ক্লাসের বন্ধুরা তাকে খুব ভালোবাসে।

এখানে ‘হাসান’ বিশেষ্য পদ। ‘হাসান’ শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহৃত ‘সে’ এবং ‘তাকে’ শব্দ দু’টি সর্বনাম পদ।

সর্বনাম পদের শ্রেণীবিভাগ: সর্বনাম পদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন:-

১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম : আমি, আমরা, মোরা, তুমি, তোমরা, তুই, সে, তিনি, তাহারা (তারা) ইত্যাদি।

২. প্রশ্নসূচক সর্বনাম : কে, কি, কাহার (কার), কোন, কিসে ইত্যাদি।

৩. আত্মবাচক সর্বনাম : নিজ, স্বয়ং, আপন, খোদ ইত্যাদি।

৪. ব্যতিহারিক সর্বনাম : নিজে নিজে, আপনা আপনি, আপনে, পরস্পর ইত্যাদি।

৫. সামীপ্যবাচক সর্বনাম : এ, এই, ইহারা (এরা) ইত্যাদি।

৬. দূরত্ববাচক সর্বনাম: ঐ, ঐসব, সব ইত্যাদি।

৭. সংযোগবাচক সর্বনাম : যে, যিনি, যাহারা (যারা) ইত্যাদি।

৮. অনাদিবাচক সর্বনাম : অন্য, পর, অপর ইত্যাদি।

৯. অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক সর্বনাম : কোন, কেহ, কেউ, কিছু ইত্যাদি।

১০. সাকুল্যবাচক সর্বনাম : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ ইত্যাদি।

সর্বনামের পুরুষ (Person)

পুরুষ তিন প্রকার। যথা:-

ক. উত্তম পুরুষ

খ. মধ্যম পুরুষ ও

গ. নাম পুরুষ।

ক. উত্তম পুরুষ: স্বয়ং বজাই উত্তম পুরুষ। যেমন:- আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।

খ. মধ্যম পুরুষ : প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। যেমন:- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনারা, আপনাদের, তোর, তোদের ইত্যাদি।

গ. নাম পুরুষ: অনুপস্থিত অথবা পরোক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীই নাম পুরুষ। যেমন:- সে, তাহারা (তারা), তাহাদের (তাদের), তাহাকে (তাকে), তিনি ইত্যাদি।

* মনে রেখো :- সমস্ত বিশেষ্য শব্দই নাম পুরুষ।

পুরুষভেদে ব্যক্তিব্যচক সর্বনামের রূপ:

সাধারণ

উত্তম পুরুষ→আমি, আমরা, আমার, আমাকে, আমাদের, আমাদেরকে, মোরা

মধ্যম পুরুষ →তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমার, তোমাদের, তোমাদিগকে, (তোমাদেরকে)

নাম পুরুষ →তাহারা (তারা), তাহাকে (তাকে), তাহার (তার), তাহাদের (তাদের), তাহাদিগকে (তাদেরকে)।

সম্ভ্রমাত্মক

উত্তম পুরুষ→-----

মধ্যম পুরুষ →আপনি, আপনারা, আপনার, আপনাকে, আপনাদের

নাম পুরুষ →তিনি, তাঁহারা (তাঁরা), তাঁহাকে (তাঁকে), তাঁহার তাঁর, তাঁহাদের (তাঁদের) তাঁহাদিগকে তাঁদেরকে) নি, ওঁরা, ওঁদের।

তুচ্ছার্থক

উত্তম পুরুষ→

মধ্যম পুরুষ →তুই, তোরা, তোর, তোদের, তোকে

নাম পুরুষ →ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, ওরা, উহা, উহারা, ও ওদের।

⇒ সর্বনামের বিশিষ্ট প্রয়োগ :

১. বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষের এক বচনে দীন, বান্দা, অধম, সেবক, দাস ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যেমন:- দীনের আরজ মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আজ্ঞা কর দাসে শৃঙ্খলা বিধানে।

২. স্বামী এবং উপাস্যের প্রতি সাধারণত ‘আপনি’ স্থানে ‘তুমি’ ব্যবহৃত হয়।

যেমন:- প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন মালিক নেই।

৩. অভিনন্দনপত্র রচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় সম্মানিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ‘তুমি’ সম্বোধন করা হয়।

যেমন:- হে বরেণ্য, তুমি এসেছ তাই আমরা আনন্দে আত্মহারা।

৪. সমবয়স্ক সাথীদের ক্ষেত্রে ‘তুমি’ এবং এবং ‘তুই’ দুটোই ব্যবহৃত হয়।

যেমন:- কিরে রতন, তুই কেমন আছিস?

৫. কবিতায় ‘আমার’ স্থানে ‘মম’, ‘আমাদের’ স্থানে ‘মোদের’ এবং ‘আমরা’ স্থানে ‘মোরা’ ব্যবহৃত হয়।

যেমন:- মম চিন্তে গীতি নৃত্যে তা তা থৈ থৈ।

মোদের গরব মোদের আশা আমরা বাংলা ভাষা।

ক্রিয়াপদ

যে পদ দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন বোঝায় তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ক্রিয়াপদ দ্বারা হওয়া, যাওয়া, করা, খাওয়া ইত্যাদি বোঝায়।

যেমন:-

হাসান চিঠি লিখে।

এ বাক্যে ‘লিখে’ শব্দটি ক্রিয়াপদ। এ শব্দটি দ্বারা কাজ করা বোঝায়।

ক্রিয়াপদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠিত হয় না। কেননা মনের ভাব প্রকাশের জন্য ক্রিয়া বা কাজ করার ব্যাপারটিই প্রধান। তাই ক্রিয়াপদকে বাক্যের প্রাণ বলে।

ক্রিয়াপদের শ্রেণীবিভাগ : বিভিন্ন অর্থে ক্রিয়াপদকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়।

১.ভাব প্রকাশ বা অর্থানুসারে ক্রিয়াপদ দুপ্রকার’ । যেমন:-

ক. সমাপিকা ক্রিয়া ও খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন:-

রিফাত কলেজে যায়। মাহফুজ চিঠি লিখে।

এখানে ‘রিফাত’ এবং ‘মাহফুজ’ কি করছে তা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে ‘যায়’ এবং ‘লিখে’ ক্রিয়াপদ দুটো সমাপিকা ক্রিয়া।

খ. **অসমাপিকা ক্রিয়া** : যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অংশ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ না হয়ে, আরো কিছু বলার থাকে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।

যেমন:- মাহমুদ ইংরেজি পড়তে.....

মোস্তফা সাইকেল চালাতে

এ বাক্যে দুটোই মাহমুদ ও মোস্তফা কি করছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্ছে না। সুতরাং এক্ষেত্রে ‘পড়তে’ এবং ‘চালাতে’ ক্রিয়া দুটো অসমাপিকা ক্রিয়া। পূর্ণাঙ্গ বাক্য গঠনের জন্য সমাপিকা ক্রিয়া অবশ্যই প্রয়োজন। যদি লেখা হয়:-

মাহমুদ ইংরেজি পড়তে লাগলো।

মোস্তফা সাইকেল চালাতে লাগলো।

তাহলে, বাক্য দুটো পূর্ণাঙ্গ বাক্য হবে।

অসমাপিকা ক্রিয়া ভাবপ্রকাশে সহায়তা করে কিন্তু তা দ্বারা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না।

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন

সাধারণত ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সাথে ইয়া (পড়িয়া), -ইলে (পড়িলে),-এ (পড়ে), তে (পড়তে), -ইতে (পড়িতে), -লে (পড়লে)-প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

‘ইয়া’ > ‘এ’ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার

হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস।

ছেলেটি অসৎ সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেল।

‘ইলে’ > ‘-লে’ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :

যত্ন করলে রত্ন মিলে।

ফুল ফুটলে গন্ধ ছড়াবে।

‘ইতে’ > ‘-তে’ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :

তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কর।

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।

২।কর্ম অনুসারে ক্রিয়াপদ তিন প্রকার। যেমন:-

ক. সক্রমক ক্রিয়া

খ. অক্রমক ক্রিয়া ও

গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

ক. সাকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কমপক্ষে একটি কর্মপদ আছে, তাকে সাকর্মক ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াপদকে কি বা কাকে প্রশ্ন করলে যে উত্তরা পাওয়া যায় তাই ক্রিয়ার কর্মপদ।

যেমন:-

শিখা চা তৈরি করে।

জেলেরা মাছ ধরে।

যদি প্রশ্ন করা হয় শিখা কি তৈরি করে? উত্তর পাওয়া যাবে:- চা। জেলেরা কি ধরে? উত্তর পাওয়া যাবে:-মাছ। সুতরাং ‘চা’ এবং ‘মাছ’ ক্রিয়ার কর্ম।

খ. অকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন:- সুমন লিখে। কবির পড়ে। ওপরের বাক্য দুটোতে কোন কর্মপদ নেই। অতএব ‘লিখে’ এবং ‘পড়ে’ ক্রিয়াপদ দু’টি অকর্মক ক্রিয়া।

গ. দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। যার একটি প্রাণিবাচক ও অপরটি বস্তুবাচক বা অপ্রাণিবাচক, তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

যেমন :- মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছেন।

উপরের উদাহরণে দেখানো ক্রিয়ার দুটি কর্ম:-

১. ছেলে (ব্যক্তিবাচক)

২. চাঁদ (অপ্রাণিবাচক)

উপরের উদাহরণে দেখানো ক্রিয়ার দুটি কর্ম-

১. ছেলে (ব্যক্তিবাচক)

২. চাঁদ (অপ্রাণিবাচক)

সুতরাং এটি দ্বিকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ। কিন্তু একই ধরনের দুটি কর্ম থাকলে সে ক্ষেত্রে সাকর্মক ক্রিয়া হবে। কিন্তু দ্বিকর্মক ক্রিয়া হবে না।

যেমন:- বাবা লায়লা ও সুমনকে ভালবাসে। এখানে লায়লা ও সুমন উভয়ই প্রাণিবাচক।

৩ : প্রযোজক ক্রিয়া .যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনায় বা চালনায় অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বা গিজন্ত ক্রিয়া বলে।

যেমন:- মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ বাক্যে দুটো কর্তা আছে। একটি ‘মা’ অপরটি ‘শিশু’। মা শিশুকে পরিচালনা করছেন তাই ‘মা’ প্রযোজক কর্তা এবং শিশু মায়ের দ্বারা

পরিচালিত হয়ে কাজটি করছে, এজন্য ‘শিশু’ প্রযোজ্য কর্তা।

★ প্রযোজক কর্তা:- যে ক্রিয়া প্রয়োজনা করে।

☆ প্রযোজ্য কর্তা:- যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

৪: যৌগিক ক্রিয়া . একটি সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়া যদি একত্রে একটি বিশেষ সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে বিভিন্ন অর্থে পড়, উঠ, থাক, আস, ফেল, দে, নী, পাড় প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত সমাপিকা ক্রিয়া একত্রে যৌগিক ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

যেমন:-

বাড়ির সকলে শুয়ে পড়ল। :- কার্য সমাপ্তি অর্থে

সাইরেন বেজে উঠল। :- আকস্মিক অর্থে

এখন যেতে পার।:-অনুমোদন অর্থে

বিষয়টা শুনে রাখ।:- তাগিদ অর্থে।

লোকটি বলতে থাকল। :- নিরন্তরতা অর্থে

শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে। :- অভ্যস্ততা অর্থে

উপরোল্লিখিত বাক্যগুলোতে শুয়ে, বেজে, যেতে, শুনে, বলতে, হয়ে:- এই অসমাপিকা ক্রিয়াগুলোর সাথে যথাক্রমে:- পড়, উঠ, পার, রাখ, থাক ধাতুযোগে গঠিত সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে যৌগিক ক্রিয়াগুলো গঠিত হয়েছে।

৫: মিশ্র ক্রিয়া . বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধনাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, হ, দে, পা, যা, কাট, গা, ছাড়, ধর, মার প্রভৃতি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে।

যেমন:-

বিশেষ্যের পর :- আমরা তাজমহল দর্শন করলাম।

বিশেষণের পর :- তোমাকে দেখে বিশেষ প্রীত হলাম।

ধনাত্মক অব্যয়ের পর:- মাথা ঝিমঝিম করছে।

শন শন করে হাওয়া বইছে।

অব্যয় পদ

ন ব্যয় = অব্যয় যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয়, তাই অব্যয়। অব্যয় শব্দের সাথে কোন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না, একবচন বা বহুবচন হয় না এবং স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা :

১. বাংলা অব্যয় শব্দ : আর, আবার, ও, হাঁ, না ইত্যাদি।

২. তৎসম অব্যয় শব্দ : যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ দৈবাৎ, পুনশ্চ, আপাতত, বশ্তত ইত্যাদি। ‘এবং’ ও ‘সুতরাং’ তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে ‘এবং’ শব্দের অর্থ এমন, আর ‘সুতরাং’ অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু বাংলায় এবং-ও, সুতরাং-অতএব অর্থে ব্যবহৃত।

৩. বিদেশি অব্যয় শব্দ : আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা, আস্তে, বেশ ইত্যাদি।

বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয়শব্দ

১. একাধিক অব্যয় শব্দযোগে : কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।

২. আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুবার প্রয়োগ : ছি ছি, ধিক ধিক, বেশ বেশ ইত্যাদি।

৩. দুটো ভিন্ন শব্দযোগে : মোটকথা, হয়ত, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।

৪. অনুকার শব্দযোগে : কুহুকুহু, গুনগুন, ঘেউ ঘেউ, শনশন, ছলছল, কনকন ইত্যাদি।

অব্যয় প্রধানত চার প্রকার :

১. সমুচ্চরী ২. অনস্বরী ৩. অনুসর্গ ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাঙ্ক।

১ : সমুচ্চরী অব্যয় .যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চরী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

যেমন ::-

ক. সংযোজক অব্যয় : উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে ‘ও’ অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটো পদের সংযোজন করেছে। তিনি সৎ তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে ‘তাই’ অব্যয়টি দুটো বাক্যের সংযোজন ঘটাবে। আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়: হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী। এখানে ‘কিংবা’ অব্যয়টি দুটো পদের (হাসেম এবং কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাবে। ‘মস্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন’। এখানে কিংবা অব্যয়টি দুটো বাক্যাংশের বিয়োজক। আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে ‘কিন্তু’ অব্যয় দুটো বাক্যের বিয়োজক। এ ছাড়াও বা, অথবা, নতুবা, নাই, নয়ত- শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে ‘অথচ’ অব্যয়টি দুটো বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। এ ছাড়াও কিন্তু, বরং-শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. অনুগামী সমুচ্চরী অব্যয় : যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে তাই তাদের অনুগামী সমুচ্চরী অব্যয় বলে। যেমন :

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্ক আছে।

২. আজ যদি (শর্তবাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।

৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পারে।

২: অনন্বয়ী অব্যয় . যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে

ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন:

ক. উচ্ছ্বাস প্রকাশে : মরি মরি ! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।

খ. স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে : হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।

গ. সম্মতি প্রকাশে : আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদন বাচকতায় : আপনি যখন বলছেন, বেশ ত আমি যাব।

ঙ. সমর্থনসূচক জবাবে : আপনি যা জানেন তা ঠিকই বটে।

চ. যজ্ঞগা প্রকাশে : উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে : ছি ছি, তুমি এত নীচ! কী আপদ ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।

জ. সম্বোধনে : ‘ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।’

ঝ. সম্ভাবনায় : ‘সংশয়ে সংকল্প সদা টলে পাছে লোকে কিছু বলে।’

ঞ. বাক্যাংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যে শোভাবর্ধন করে এদের বাক্যাংকার অব্যয় বলে।

যেমন : ১. কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজও মনে।

২. ‘হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।’

৩: অনুসর্গ অব্যয় . যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের

অনুসর্গ অব্যয় বলে।

যথা: ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)।

অনুসর্গ অব্যয় ‘পদান্বয়ী অব্যয়’ নামেও পরিচিত।

অনুসর্গ অব্যয় দুপ্রকার :

ক. বিভক্তিসূচক অব্যয়

খ. বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

৪ : অনুকার অব্যয় .যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার বা ধ্বন্যাঙ্ক অব্যয়

বলে। যথা :

বজ্রের ধ্বনি : কড়কড় মেঘের গর্জন : গুঁড়গুঁড়।

বৃষ্টির তুমুল শব্দ : বামবাম সিংহের গর্জন : গরগর।

শ্রোতের ধ্বনি : কলকল। ঘোড়ার ডাক : চিহি চিহি।

বাতাসের গতি : শনশন। কাকের ডাক : কা কা।

শুষ্ক পাতার শব্দ : মরমর। কোকিলের রব : কুহু কুহু।

নূপুরের আওয়াজ : রুমঝুম। চুড়ির শব্দ টুং টাং।

অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয় শ্রেণীভুক্ত। যথা।

ঝাঁ ঝাঁ (প্রখ্যতাবাচক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাবাচক), কচকচ্, টলমল,

ঝলমল, চকচক, ছমছম, টনটন, খটখট ইত্যাদি।

বাক্য (Sentence)

বাক্য (Sentence) : এক বা একাদিক বিন্যস্ত পদ যখন একটি বক্তব্য বা মনের অখন্ড ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে বাক্য বলা হয়। যেমন : রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের জাতিসত্তার অংশ হয়ে আছে।

⇒ **গঠনগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণীবিন্যাসঃ**

গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার। যথা :

১. সরল বাক্য (Simple Sentence)
২. জটিল বাক্য (Complex Sentence)
৩. যৌগিক বাক্য (Compound Sentence)

১: সরল বাক্য . যে বাক্যে একটি উদ্দেশ্য (কর্তা) এবং একটি বিধেয় (অন্তত একটি সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলা হয়। যেমন : সফিক পড়ে।

শোভন হাত মুখ ধুয়ে টেবিলে বসে কবিতা পড়ছে। এখানে সফিক ও শোভন উদ্দেশ্য এবং পড়ে ও হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে বসে কবিতা পড়ছে বিধেয়।

২: জটিল বাক্য . যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের অধীনে এক বা একাধিক আশ্রিত খন্ডবাক্য থাকে, তাকে জটিল বাক্য বলা হয়। যেমন : যে ব্যক্তির নিজের বুদ্ধি নেই, সে অন্যের কথায় চলে।

জটিল বাক্যে দুটি খন্ডবাক্য সাধারণত সাপেক্ষ সর্বনাম বা অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে। সাপেক্ষ সর্বনাম ও অব্যয়গুলোর রূপ হলো :
যে-সে, যেহেতু, যদি-তবুও, যখন-তখন, যত-তত প্রভৃতি।

৩: যৌগিক বাক্য . দুটি সরল বা জটিল বাক্য মিলে যে বাক্য গঠিত হয়, তাকে যৌগিক বাক্য বলা হয়।

যেমন : রফিক নিয়মিত পড়াশোনা করে, সুতরাং সে ভালো ফলাফল করেছে।

তুমি যদি সময় দাও, তবে আমাদের দেখা হবে এবং দেশ বিষয়ক আলোচনা হবে।

যৌগিক বাক্যের দুটি খন্ডবাক্য সাধারণত সংযুক্তি অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে। সংযুক্ত অব্যয়গুলোর রূপ হলো; এবং, কিন্তু, সুতরাং, নতুবা, তাহলে, ও প্রভৃতি।

⇒ অর্থগত দিক থেকে বাক্যের শ্রেণীবিন্যাসঃ

অর্থগত দিক থেকে বাক্য প্রধানত পাঁচ প্রকার। যথা:

১. নির্দেশক বাক্য (Assertive Sentence)
২. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (Impertive Sentence)
৩. প্রশ্নসূচক বাক্য (Interrogative Sentence)
৪. কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য (Operative Sentence)
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য (Exclamatory Sentence)

১ নির্দেশক বাক্য .(Assertive Sentence) : যে বাক্য সংবাদ, তথ্য বিবরণ, ঘটনা বিবৃত থাকে, তাকে নির্দেশক বাক্য বলা হয়।

যেমন : পাকিস্তান ভারত সীমান্ত এখন শান্ত।

নির্দেশক বাক্য দুই প্রকার :

ক. অস্তিত্বাচক বাক্য খ. নেতিবাচক বাক্য

ক. অস্তিত্বাচক বাক্য : এতে কোনো নির্দেশ, ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার সংবাদ থাকে। যেমন : শকুন্তলা অত্যন্ত রূপসী ছিলেন।
বাংলাদেশ এখন স্বাধীন দেশ।

খ. নেতিবাচক বাক্য : এ ধরনের বাক্যে কোনো কিছু হয় না বা ঘটছে না- নিষেধ, আকাজ্জা, অস্বীকৃতি ইত্যাদি সংবাদ কিংবা ভাব প্রকাশ করা যায়।

যেমন: শকুন্তলা মোটেই অসুন্দরী ছিলো না।

বাংলাদেশ এখন পরাধীন দেশ নয়।

২) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য .Impertive Sentence : (যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ দেওয়া হয়,তাকে

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলা হয়।

যেমন : এখনই বাড়ি যাও।

নিয়মিত পড়াশোনা করবে।

৩) প্রশ্নসূচক বাক্য .**Interrogative Sentence** (: কৌতূহল নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা বা জানার ইচ্ছা যে বাক্যে বিবৃত হয়,

তাকে প্রশ্নবাচক বাক্য বলা হয়।

যেমন : সাদ্দাম কি বেঁচে আছেন?

পর্তুগালের রাজধানীর নাম কী?

৪ কামনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য .(**Operative Sentence**: (মঙ্গল- অমঙ্গল কামনা বা মনের ইচ্ছা প্রকাশ মূলক

বাক্যকে প্রার্থনামূলক বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বলা হয়।

যেমন : খোদা তোমার মঙ্গল করুক। স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক।

৫) বিস্ময়সূচক বাক্য .**Exclamatory Sentence**: (আনন্দ-বেদনা, ঘৃণা- ক্রোধ-ভয়, উচ্ছ্বাস-আবেগ, বিস্ময়-কৌতূহল

যে বাক্যে প্রকাশিত হয়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়।

যেমন : কতই না সুন্দর তাজমহলের দৃশ্য!

হায়, সুস্থ ছেলেটি মারা গেলো!

একটি সার্থক বাক্যের প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে।

যথা :

১. আকাঙ্ক্ষা (Expectancy)
২. আসত্তি (Proximity)
৩. যোগ্যতা (Computability)

১) আকাঙ্ক্ষা .**Expectancy**: (একটি বাক্য শ্রোতার কাছে বোধগম্য হবার শর্ত বক্তব্যটি প্রকাশের জন্য যথার্থ একগুচ্ছ

শব্দ। যদি একটি শব্দ বাক্যের অনুপস্থিত থাকে, তবে বক্তব্য প্রকাশ যথাযথ হয় না। বক্তার বক্তব্যের অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্যে যতগুলো পদের প্রয়োজন তার কোন একটি বা একাধিক পদ যদি বাক্যের না থাকে, তবে ঐ অবশিষ্ট পদ শোনার যে ইচ্ছা তাকে ব্যাকরণের পরিভাষায় বাক্যের 'আকাঙ্ক্ষা' বলা হয়।

অর্থাৎ-বাক্যের অর্থ ভালভাবে অনুধাবনের জন্য শ্রোতার এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে 'আকাঙ্ক্ষা' বলে।

যেমন : আমি আজ বাড়ি

যাবো। এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয় 'আমি আজ বাড়ি'-তবে 'যাবো' শব্দটি শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। একটি বাক্যে আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি না থাকলে সেটি সার্থক বাক্য হবে না।

২) আসত্তি .**Proximity**: (একটি বাক্যে ব্যবহৃত পদসমষ্টির পরস্পর অস্থয় বা সম্পর্ক অনুযায়ী যথার্থ বিন্যাসকেই আসত্তি বলা হয়।

যেমন : তারেক স্টেডিয়ামে বসে ফুটবল খেলা দেখছে।

এ ক্ষেত্রে- ‘তারেক ফুটবল বসে খেলা স্টেডিয়ামে দেখছে।’ বলা হয়, তাহলে পদসমষ্টির পরস্পর অস্থয় বা সম্পর্ক অনুযায়ী যথার্থ বিন্যাস হয় না। সুতরাং এমনটি হলে একটি বাক্য সার্থক হবে না।

৩ যোগ্যতা .**(Computability)** : প্রকৃতির শাস্ত্র সত্য বিকৃত বা পরিবর্তন না করে একটি বাক্যের অর্থ যথার্থভাবে প্রকাশের নামই বাক্যের ‘যোগ্যতা’।

অর্থাৎ একটি বাক্যের অর্থগত বাস্তবতা থাকতে হবে।

যেমন: পাখি আকাশে ওড়ে। এ বাক্যটি বাস্তব সম্মত অর্থ প্রকাশ করেছে। এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, ‘গরু আকাশে ওড়ে’ - তাহলে বাক্যটি ‘যোগ্যতা’ হারাবে। একটি সার্থক

বাক্যের অপরিহার্য শর্ত এই ‘যোগ্যতা’।

এ ছাড়াও আরো কিছু ভুল বাক্যকে ত্রুটিযুক্ত করে:

১. **বাগধারার শব্দ পরিবর্তন** : ভাষায় প্রচলিত বাগধারা পরিবর্তন করে লিখলে বাক্য ত্রুটিযুক্ত হয়। যেমন : ‘অরণ্যে রোদন’-এর স্থলে ‘বনে রোদন’, ‘ঘোড়ার ডিম’-এর স্থলে ‘অশ্বের ডিম’- ব্যবহার।

২. **গুরুচড়ালি দোষ** : সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ বা তৎসম শব্দের সাথে অতৎসম শব্দের মিলনে শব্দগঠন ভাষার গুরুচড়ালি দোষ। এ দোষ বাক্যকে ত্রুটিযুক্ত করে। যেমন : ‘অক্ষিকোটর’- এর স্থলে ‘আঁখিকোটর’ বা ‘অাঁখিপল-ব’ - এর স্থলে ‘চোখ পল-ব’ এবং সাধু ভাষারীতির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতির সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ও অনুসর্গ মিশ্রণ।

৩. **বাহুল্য দোষ** : একাধিক বহুবচন বা যথার্থ পদপ্রয়োগের ভুলকে বাহুল্য দোষ বলা হয়। যেমন : সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো হয়েছে। এখানে সকল এবং দের দুটির বহুবচন নির্দেশক শব্দ একটি বাক্যে এসেছে।

৪. **পদের ভুল প্রয়োগ** : এক পদের স্থলে অন্য পদের ব্যবহার বাক্যকে ত্রুটিপূর্ণ করে। যেমন : ‘সুন্দর’ -এর স্থলে ‘সৌন্দর্য’, ‘মধুর’ স্থলে ‘মাধুর্য’ ব্যবহার।

৫. **উপমার ভুল প্রয়োগ** : উপমার ভুল প্রয়োগ বাক্যকে ত্রুটিযুক্ত করে। যেমন : ‘হৃদয় আকাশে মেঘ জমেছে।’ এ ক্ষেত্রে ‘হৃদয় সাগরে মেঘ জমেছে।’ উপমার ভুল প্রয়োগ। কেননা সাগরে মেঘ জমে না।

৬. **অশুদ্ধ বানান** : অশুদ্ধ বানান বাক্যকে ত্রুটিযুক্ত করে। যেমন : সাধারণ না লেখে সাধারণ কিংবা বিশেষ-ষণ না লেখে বিশেষ-ষন লেখলে।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কাল

★ যে সময়ে কোন ক্রিয়া ঘটে থাকে, সেই সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। ক্রিয়ার কাল প্রধানত: তিন প্রকার। যথা-

(১) বর্তমান কাল, (২) অতীত কাল ও (৩) ভবিষ্যৎ কাল। এদের

প্রত্যেকটি আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা -

১. বর্তমান কাল:

(ক) সাধারণ বর্তমান- সাধারণ ভাবে এবং সচরাচর যখন কোন ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে।

যেমন-আমি বই পড়ি।

(খ) ঘটমান বর্তমান - যে কাল শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাল বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়।

যেমন- মুনীর বই পড়ছে। নীরা গান গাইছে।

(গ) পুরাঘটিত বর্তমান - যে ক্রিয়ার কাজ অল্পক্ষণ পূর্বে শেষ হয়েছে, অথচ তার ফল বা প্রভাব এখনও বর্তমান, তার কালকে পুরাঘটিতে বর্তমান বলে। যেমন-এবার হাসান এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

২. অতীত কাল:

(ক) সাধারণ অতীত - যে ক্রিয়া সাধারণভাবে অতীত সময়ে সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার কালকে সাধারণ অতীত কাল বলে।

যেমন- প্রদীপ নিভে গেল।

(খ) ঘটমান অতীত - যে ক্রিয়া অতীত কালে চলছিল এবং তখনও শেষ হয় নাই বোঝায়, তার কালকে ঘটমান অতীত কাল বলে। যেমন - আমি তখন বই পড়ছিলাম।

(গ) পুরাঘটিত অতীত - যে ক্রিয়া অতীতে বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন-ডাক্তার আসার পূর্বেই রোগী মারা গেল।

(ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত - যা পূর্বে সচরাচর ঘটিত, তার কাল নিত্যবৃত্ত অতীত কাল। যেমন - আমি কাজটি করতাম।

৩. ভবিষ্যৎ কাল:

(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ - যে কাজ এখনও হয় নাই, ভবিষ্যৎ কালে সাধারণ ভাবে ঘটবে, তার কালকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে।
যেমন - আমি কাজটি করব।

(খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ - যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটতে থাকবে, তার কাল ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল। যেমন- আমি কাজটি করতে থাকব।

(গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ - ভবিষ্যৎ কালে কোন ক্রিয়া ঘটে শেষ হয়ে থাকবে বোঝালে তার কালকে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল বলে।
যেমন - আমি কাজটি শেষ করে থাকব।

বাচ্য

বাচ্য:

বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃ ও কর্মপদের বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত যে রূপবিশেষ তাকে বাচ্য বলে। 'বাচ্য' শব্দের অর্থ 'বক্তব্য'। অতএব, বলিবার বিষয়কে বাচ্য বলে। বাচ্য তিন প্রকার।

:কর্তৃবাচ্য (ক) যে বাক্যের ক্রিয়ায় অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে কর্তার প্রাধান্য থাকে, অর্থাৎ কর্তা যে পুরুষের ক্রিয়াও সেই পুরুষের হয়, তা কর্তৃবাচ্য।

যেমন - মেজবাহ কোরান পড়িতেছে।

আমি ভাত খাইয়াছি।

:কর্মবাচ্য (খ) যে বাক্যে কর্মেরই প্রাধান্য এবং ক্রিয়াটি কর্মের অনুগামী অর্থাৎ কর্ম যেই পুরুষের - ক্রিয়াও সেই পুরুষের হয়, তাকে কর্মবাচ্য বলে।

যেমন - মেজবাহ কর্তৃক কোরান পঠিত হইয়াছে।

আমা কর্তৃক ভাত খাওয়া হইয়াছে।

:ভাববাচ্য (গ) যে বাক্যে ক্রিয়াটি অকর্মক এবং উহার অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে ভাববাচ্যের বাক্য বলে।

যেমন - মেসবাহর যাওয়া হবে না।

আমার খাওয়া হইয়াছে।

⇒ **কর্ম:কর্তৃবাচ্য**-যে বাক্যে কর্মকারক কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম কর্তার যত্ন ব্যতীত সম্পাদিত হয় তাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্যের বাক্য বলে। যেমন - শাঁখ বাজে। ফুল ফোটে।

বাচ্য পরিবর্তনের নমুনা (কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য):

⇒ কর্তৃবাচ্য - বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।

কর্মবাচ্য - বিদ্বান সকলের দ্বারা আদৃত হন।

⇒ কর্তৃবাচ্য - সুজন পুস্তক পাঠ করছে।

কর্মবাচ্য - সুজন কর্তৃক পুস্তক পঠিত হচ্ছে।

⇒ কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য:

⇒ কর্তৃবাচ্য - আমি যাব না।

ভাববাচ্য - আমার যাওয়া হবে না।

⇒ কর্তৃবাচ্য - তোমরা কখন এলে?

ভাববাচ্য - তোমাদের কখন আসা হল?

⇒ কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য:

⇒ কর্মবাচ্য - দস্যুদল কর্তৃক গৃহটি লুণ্ঠিত হয়েছে।

কর্তৃবাচ্য - দস্যুদল গৃহটি লুণ্ঠন করেছে।

⇒ কর্মবাচ্য - হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ বিধ্বস্ত হয়।

কর্তৃবাচ্য - হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করেন।

⇒ ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য:

⇒ ভাববাচ্য - তোমাকে হাঁটতে হবে।

কর্তৃবাচ্য - তুমি হাঁটবে।

⇒ ভাববাচ্য - তার যেন আসা হয়।

কর্তৃবাচ্য - সে যেন আসে।